নাটক, মঞ্চ ও অভিনয় শিল্প

আবু আহমদ আবদুল আলী

[*মরহুম আবু আহমদ আবদুল আলী বাঙালি মুসলমান সমাজে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিশেষ করে নাট্য জগতের একজন পুরোধা ছিলেন। নাটক ও অভিনয়ের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ থেকে তিনি শৌখিন নাট্য চর্চায় জড়িয়ে পড়েন। যে সময় তিনি নাট্যচর্চা ও অভিনয় শুরু করেছিলেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, সে সময় নাট্যচর্চায় বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এজন্য অবশ্য এ. এ. আবদুল আলীর পারিবারিক প্রেক্ষিতটা একটু জানা দরকার।*

ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলায় তাঁর পিতা মৌলভী আহমদ ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম কয়েকজন মুসলিম গ্রাজুয়েটদের অন্যতম। ১৮৬৩/৬৪ সালে পিতা মুন্সী ফইজউদ্দিনের ঘরে জন্ম আজকের বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু ময়মনসিংহে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৩ সালে। মৌলভী আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র আবু আহমদ আবদুল আলীর বয়স তখন মাত্র ১০ বছর। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হয়েছে এ. এ. আবদুল আলীকে। তারপরও নাটকের প্রতি ভালবাসা তার কখনোই শেষ হয়নি। পেশায় একজন পুলিশ কর্মকর্তা হওয়ার পরও নাটক ও অভিনয় ছিল তাঁর অন্তপ্রাণ। বাংলাদেশের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র (যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হয়েছিল ১৯৫৮ সালে) 'আকাশ আর মাটি'-তে তিনি অভিনয় করেছিলেন। তবে তাঁর অভিনয় চর্চার কেন্দ্রে ছিল বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জ। ১৬ হরকান্ত ব্যানার্জী রোডের আলী সাহেবের বৈঠকখানা ছিল '৬০-র দশকে নারায়ণগঞ্জের নাট্যমোদীদের আড্ডাখানা। ভূপেশ ঘোষ, আবদুল আহাদ, মুজিব, সুরেন ব্যানার্জী, সুনীল রায়, কালিপদ সেনসহ নারায়ণগঞ্জের নাট্যচর্চার পুরোধারা আলী সাহেবকে ঘিরেই গড়ে তুলেছিলেন পাটের শহরের নাটকের ও অভিনয়ের প্রবাহ। তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিনীত নাটক ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর'। জিয়া হায়দারের পরিচালনায় ঢাকায় তিনি এই নাটকটি করেছিলেন।

*আলী সাহেবের নাট্যচর্চা তাঁর ছেলে-মেয়েদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর তৃতীয় পুত্র মরহুম আবু আলী রহমতুল কিবরিয়া আমৃত্যু নারায়ণগঞ্জের নাট্য চর্চা ও মঞ্চ নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জের অন্যতম পুরনো নাট্য গোষ্ঠী নারায়ণগঞ্জ নাট্য নিকেতনের এক যুগের বেশি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম কিবরিয়া বেতারে এবং চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। তাঁর কন্যা মানে তামারা কিবরিয়া (হিমন) নারায়ণগঞ্জের মঞ্চে অল্প সময়ের জন্য হলেও নতুন প্রজন্মের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে, অংশ নিয়েছে বেতার নাটকে। এ. এ. আবদুল আলীর অপ্রকাশিত এই লেখাটি তাঁর পৌত্রী তামারা কিবরিয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত। নাটক সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রতিফলনসহ বাংলা নাটকের বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধটিতে। এটি তিনি সম্ভবত ১৯৬৫-৬৬ সালের দিকে লিখেছিলেন। বানান ও ভাষারীতি প্রায় অপরিবর্তিত রেখে এটি ছাপা হলো-**আসজাদুল কিবরিয়া**]*

নাটক আর নাটুকে– যারা নাটক লেখেন, দেখেন এবং অভিনয় করেন তাদেরকেই এক কথায় নাটুকে বলা চলে। আমি নিজেকে একজন নাটুকে বলেই মনে করি কারণ নাটক দেখবার পড়বার, এবং মঞ্চস্থ ও অভিনয় করার স্পৃহা আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে।

আমি যখন প্রথম নাটক দেখি সে অনেক বার আগেকার কথা। তখন আমার বয়স ১০ কি ১১-১৯১৪ সন। তখনকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অমরেন্দ্র দত্ত, দামীবাবু, তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী প্রভৃতির অভিনয় দেখে অভিনয় করবার সখ জাগে। ছেলেবেলার সেই সখকে রূপ দিয়েছি সৌখীন অভিনেতা হিসেবে। নাট্যজগতে আমার বিচরণ হয়েছে একান্তই সৌখীনভাবে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ থেকে অবশ্য চিরকালই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সাথে যোগ রেখেছি দর্শক হিসেবে। যখনই কোন প্রতিভাশালী অভিনেতা ও পরিচালকের আবির্ভাব হয়েছে এবং তখনই মফস্বল থেকে ছুটে গিয়েছি কলকাতায় অভিনয় দেখবার জন্য। অমর দত্ত, শিশির ভাদুরী, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী, দানিবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকান্দ মুখোপাধ্যায়, কুঞ্জ চক্রবর্তী, চুনীবাবু, হাদুবাবু, কাশীবাবু, নেপাবল, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুরী, জীবন গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিং, মনোরঞ্জন ভটাচার্য্য, ধিরাজ ভট্টাচার্য, ইন্দুবাবু, অহিন্দ্র চৌধুরী, রবিরাম, ভুপেন রায়, নরেশ মিত্তির, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্তির, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, কুসুম কুমারী, কৃষ্ণ ভামীনি, কঙ্কাবাত, বসন্ত সুন্দরী, শশী মুখী, আশ্চয্যময়ী, রাণীবালা, চারুশিলা, প্রথা, নিভাননী, সেফালী, (পুতুল), নীহার বালা, শান্তিগুপ্তা, বড় সুশিলা, ছোটসুশিলা, সরজু বালা, মলিনা, উমাসুন্দরী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিজের জীবনে তৎকালিন শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি বহুবার

মঞ্চস্থ ও অভিনয় করার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিশেষ করে– সীতা, দেবলা দেবী, কর্নাজুন, পথের শেষে, চাঁদ সওদাগর, রমা, বিজয়া, ষোড়শী, রমুবীর, সুরলা, চন্দ্রগুপ্ত, কেদার রায়, কারাগার, ইরানের রানী, শেষরক্ষা, বিসর্জন, কালিন্দী, মাটির ঘর, মন্ত্রশক্তি এবং আরও অনেকগুলি নাটক পরিচালনা এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করবার সৌভাগ্যও আমার কয়েকবার হয়েছে। এছাড়া চাঁদবিবি, প্রফুল্ল, গৃহলক্ষি, বণবীর, পানিপথ, শাহ্জাহান, বীররাজা, মিশর কুমারী, হাউসফুল, মানময়ী-গালর্স-স্কুল, মানময়ী-বয়েজ-স্কুল, প্রতাপাদিত্য, বামায়নের আর্ট, প্রাণের দাবি, আপটুডেট, দুই পুরুষ, পলাশীর পরে ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছি। সুদীর্ঘকাল এই ভাবে সৌখীন হয়েও সমসাময়িক নাট্যধারার সাথে যোগ রেখেছি।

বাংলা নাট্যসাহিত্য আলোচনা করলে দেখব নাট্যান্দোলনে সৌখীনদের বিশেষ দান আছে। কিন্তু সে দান সাধারণভাবে কোনদিন স্বীকৃতি পায়নি এবং পাওয়াও সম্ভব নয়। সখ যদি পেশায় না পরিণত হয় তবে তা স্থায়ী হতে পারে না– কেন পারে না সেই কথাই সংক্ষেপে বলবো। নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধে যে কথাই বলবো সেটা হবে একজন সৌখীন অভিনেতা ও পরিচালকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

বাংলাদেশে আগে যাত্রা বা পালা গানের প্রচলন ছিল। প্রথম যুগে এ পালায় কেবল মাত্র 'রাধা কৃষ্ণে'র গান ও নাচ হতো। পরবর্তী কালে বিদ্যাসুন্দর পালাগানের প্রচলন ছিল। আধুনিক নাটক বলতে যা বুঝি তা ছিল না। এই নাটক আনেন আমাদের দেশে সর্বপ্রথম একজন বিদেশী নাট্যকার।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হেরাসিন লেবেদেফ নামে এক রুশ ভদ্রলোক বাংলাদেশে কলকাতায় সর্বপ্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। লেবেদেফকে নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে তার থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সে থিয়েটারের জীবনও হয় স্বল্পস্থায়ী– মাত্র দুবছরের। তিনি দু'খানি ইংরেজী নাটকের অনুবাদ মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকে বিদ্যাসুন্দরের পালা গান থেকে জুড়ে দিয়েছিলেন– জনপ্রিয়তার কারণে। অভিনয় করিয়েছিলেন এ দেশীও অভিনেতা ও অভিনেত্রী দিয়ে। সে যুগের পক্ষে এই প্রচেষ্টা অসাধারণ।

এর অনেক বছর পরে এদেশে বাঙ্গালী নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে অভিনীত হয়েছিল ইংরেজিতে-জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত অংশ ও উত্তররাম চরিত্র। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তা সুপরিচিত হয়ে উঠে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে– অভিনেতা বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সাফল্য। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন নবীন বসু মহাশয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই নাটকের হিড়িক পড়ে যায়। ঐ বৎসর আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং উদ্বোধন হয় 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দ্বারা। নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চে 'কুলীন ফুল-সর্বস্ব' নাটক বেশ জমে উঠে। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' সংশ্লিষ্ট 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'– এখানেই মধুসুদনের 'শর্মিষ্ঠা' অভিনিত হয় সাফল্যের সঙ্গে। পাথুরিয়া ঘাটায় 'রঙ্গনাট্যালয়' আর একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ– প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। রাজা দেবী কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে স্থাপিত হয় 'সোভা বাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি' যেখানে অভিনিত হয় মধুসুদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর– রঙ্গমঞ্চ সৌখীন রঙ্গমঞ্চপথের একটি বিশিষ্ট স্থানে অধিকারী। এই যে নাট্যধারাটি চলে আসছিল এর সমস্তটাই সৌখীন সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালিন রাজা-মহারাজারা।

কলকাতায় সৌখীন সম্প্রদায় নাটকের উদ্বোধন করে ক্ষান্ত হয়েছিলেন– কিন্তু এর ঢেউ গিয়ে আঘাত করেছিল মফস্বলের তটে, ফলে পরে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র নাট্যান্দোলন দেখা দেয়। বহু রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরাই পরবর্তী কালে নাটকের প্রথম পাঠ পরিবেশন করেন।

'সৌখীনেরা সখের ঝোঁকে নাট্যান্দোলন করেন কিন্তু জীবনের সাধনা করে নেন নি। সখ কারুর নাটক লিখবার, কারুর অভিনয় করবার, কারুর মঞ্চ তৈরি করবার, কারোর বা বৈদগ্ধের পরিচয় দেবার, কারুর বা সাহেবদের বাহাবা নেবার। সখ মিটিলেই সৌখীনেরা সরে পড়েন।' বাংলা নাট্যান্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। একে একে সকলেই সরে পড়লেন। এদের বেশীরভাগ ছিলেন রাজা মহারাজা অথবা নতুন বেনিয়া অভিজাত। এরা যখন সরে পড়লেন তখন আর একদল সৌখীন অভিনেতা এগিয়ে এলেন নেশাকে পেশা করে নেওয়ার জন্য। এদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃত লাল, ধর্মদাস, রাধামাধব, অমর দত্ত প্রমুখ যারা আধুনিক বাংলা

আমাদের ক্ষেত্রে বাধা এল সমাজের চাইতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থেকে– আমাদের ধর্ম চেতনা ও বিশ্বাসের কাছ থেকে। নিজের প্রতিভা ও শক্তি দিয়ে সমাজকে লঙ্ঘন করা যায়, কিন্তু যখন বাধা আসে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে– যুগাতীতের সংস্কার থেকে, ঐতিহ্যের প্রবাহ থেকে, তখন তাকে অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না– সাধারণ নাটুকেদের পক্ষে। আমরা তাই চিরকাল সৌখীন নাটুকে রয়ে গেলাম, নাটককে জীবনের সাধনা করতে পারলাম না। আমাদের অক্ষমতা থেকে আশা করি আজকের নবীন নাটুকেরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

থিয়েটারের স্মরণীয় ও বরণীয় প্রতিষ্ঠাতা। এরাই প্রথম বুঝে ছিলেন, সখকে জীবনের সাধনা করে তুলতে না পারলে নাট্যশালাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবেনা এবং জীবনের সাধনা করতে হলে বৃত্তি হিসেবে নাটকেই গ্রহণ করতে হবে। কণ্ঠে থাকবে বিশেষ বাণী, অন্তরে থাকবে বিশেষ আদর্শ– যে বাণী শুনবার জন্য শ্রোতা সমাবেশ হবে– আদর্শের মূল্য দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে দেশের জনসাধারণ। আদর্শের শিকড় থাকবে দেশের মাটিতে।

গিরিশ বাবু পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্থায়ীরূপ দিতে চাইলেন। তিনি অভিনয় করলেন– নাটক লিখলেন– মঞ্চ সাজালেন। নাটককেই তিনি আকড়ে ধরলেন– এবং পেশাদার নাট্য সম্প্রদায় গড়ে উঠল; ব্যবসায় ভিত্তিক রঙ্গ মঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হল। তৎকালিন সবকয়টি রঙ্গমঞ্চ ও নট সম্প্রদায়ের সাথে গিরিশ বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগছিল। নাটককে তিনি জন-সাধারণের দুয়ারে এনে দিলেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন জনসমর্থনের উপর। ফলে নাটকে এল গতি ও আবেগ– এই গতিকে অবলম্বন করেই বাংলার নাটক এগিয়ে চলল। একে পরিপুষ্টি করলেন দিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ সাহিত্যিক নাট্যকারগণ।

সৌখীনেরা অবশ্য একবারেই থেমে ছিলেন না যদিও তাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথ ছিলনা তবুও অস্তিত্ব ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। এমনি এক সৌখীন সম্প্রদায় ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট থেকে এলেন শিশির কুমার, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ এবং আরও অনেকে। গিরিশ বাবু তাকে দিলেন প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। সে কালে নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সমাজে অভিনেতাদের বিশেষ সম্মান ছিলনা। কারণ তখন ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনয়ে নামতেন না। মেয়েরা যারা অভিনয়ে অংশ নিতেন তারা আসতেন সমাজের পতিত অংশ থেকে। কিন্তু শিশির বাবু আপন

প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা আদায় করে দিলেন। এর জন্য তাঁকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

তিনি যে সম্মান আদায় করলেন তা আমাদের মুসলমান সমাজে কাজে লাগলনা। আমাদের ক্ষেত্রে বাধা এল সমাজের চাইতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থেকে– আমাদের ধর্ম চেতনা ও বিশ্বাসের কাছ থেকে। নিজের প্রতিভা ও শক্তি দিয়ে সমাজকে লঙ্ঘন করা যায়, কিন্তু যখন বাধা আসে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে– যুগাতীতের সংস্কার থেকে, ঐতিহ্যের প্রবাহ থেকে, তখন তাকে অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না– সাধারণ নাটুকেদের পক্ষে। আমরা তাই চিরকাল সৌখীন নাটুকে রয়ে গেলাম, নাটককে জীবনের সাধনা করতে পারলাম না। আমাদের অক্ষমতা থেকে আশা করি আজকের নবীন নাটুকেরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন। নাটকের এই ইতিহাস হয়তো অনেকের কাছে বাহুল্য মনে হবে কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। একথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি যে শিল্পকে সখ হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিন্তু তার দ্বারা শিল্পের সৃষ্টি ও পরিবর্দ্ধন সম্ভব হয় না– শিল্প বন্ধা হয়ে পড়ে। নাটকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল সখের সম্প্রদায়ের হাতে তবু প্রাণ ও গতি পেয়েছিল পেশাদারদের হাতে।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম মনে হতে পারে রবীন্দ্র নাট্য সাধনা। তাঁর নাট্য সাধনার পথ আবার ভিন্ন। সে পথ নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবু এটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি পেশাদার না হলেও তাঁর একটি সম্প্রদায় ছিল এবং তার আচার্য ছিলেন তিনি নিজে।

পেশাদার পরিচালকের চাইতে সৌখীন পরিচালকের দায়িত্ব অনেকখানি বেশী কারণ এখানে অভিনেতারা থাকেন তানভিতে। পরিচালনার কথা যখন এসে পড়ল তখন এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। নাটক পরিচালক একই সাথে অভিনেতা, নাট্যকার, মঞ্চ পরিচালক, আলোক শিল্পী, প্রম্পটার ও দর্শক। মঞ্চের সঙ্গে যে সকল বিভিন্ন শিল্পী কাজ করেন তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যতান সৃষ্টি করাই পরিচালকের প্রধানতম কর্ত্তব্য। একাধারে তিনি যেমন প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়, বাক্যবিন্যাস, অঙ্গবিন্যাস, স্বরবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করবেন তেমনি মঞ্চকে দৃশ্যপটের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে সজ্জিত করবেন তার প্রতি ও তার লক্ষ থাকবে তীক্ষ্ণ। এই সূত্রে আমার ছেলেবেলায় দেখা কয়েকটি নাটকের কথা মনে পড়ছে– ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে আগা হাশর নামে এক ভদ্রলোক তার পারিবারিক নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে কলকাতায় আসেন। তৎকালিন হেলীডে পার্কে তাবু খাটিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। তাঁর 'কাতলে নাজীর' 'জুলমে ওয়াফা', 'ইহুদীকী-লাড়কী'– এই তিনটি উর্দু নাটক দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়। এ ছাড়া আলফ্রেড থিয়েটারে বন্ধের পার্শি নাট্য সম্প্রদায়ের নেতা খাচাত্তজীর অভিনয় দেখবারও সৌভাগ্য হয়। এদের কথা বলছি এই কারণে যে এদের নাট্য পরিচালনা– দৃশ্য, মঞ্চ ও অঙ্গ সজ্জার-ক্ষেত্রে যে কলা কৌশলের প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব।

আগা হাশের দৃশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য মঞ্চের উপর পালকী ও ঘোড়া এনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি খাঠাত্তজী দুঃশাসনের বক্ষ-রক্ত-পান দৃশ্যে ভীমের রক্ত পানকে সত্যই ভয়াবহভাবে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। পরবর্তিকালে এক এক জন পরিচালক এক এক প্রকার পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ দৃশ্যপট ও অঙ্গ সজ্জার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আবার কেউ কেবল অভিনয়ের উপর জোর দিয়েছেন। আধুনিক কালে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এই দিক থেকে দৃশ্যপটতে সুন্দর ও সজীব করার অনেক উপকরণ পরিচালকের হাতে এসেছে। বিশেষ দৃশ্যে বিশেষ বিশেষ আলোক নিক্ষেপ ও নাটককে বাস্তবতা দান করেছে।

নাটক ও মঞ্চের কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা বলে ফেল্লাম– না বলে উপায় ছিল না। কারণ নাটক এমন এক শিল্প যেখানে শিল্পী একক ভাবে কিছু করতে পারেন না তেমনি নাটক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এর বিশেষ কোন দিক নিয়ে একক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবু বলতে চেষ্টা করেছি। আগেই বলেছি আমি সৌখীন নাটুকে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বুঝেছি নাটককে সবচাইতে বেশী যোগ রাখতে হবে দেশের সাথে; দেশের জনসাধারণের সাথে। না হলে নাটক বাঁচবে না। নাট্যকার কেবল দেশের সর্ব সাধারণের ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে রূপ দেবেন তাই নয়, তিনি নতুন পথের ও নতুন দিনেরও সন্ধান দেবেন। সমাজ নাটকের মধ্যে যেমন একদিনে নিজের অতীত ও বর্তমানকে দেখবে তেমনি নিজের ভবিষ্যৎকেও প্রত্যক্ষ করবে তবেই নাটক সার্থক হয়ে উঠবে। পূর্ব-পাকিস্তানে নাটক এখনও দানা বেধে উঠতে পারেনি। বেশ কিছু নাট্যকার নাটক লিখছেন– শহরে বন্দরে ছোট বড় সৌখীন অভিনেতারা সেগুলিকে মঞ্চে তুলছেন, কিন্তু নাটক কোন বিশেষ পথ ধরতে পারছেনা।

এদেশের নাটকের প্রকৃতি ও স্বরূপ এখনও তেমনভাবে ফুটে উঠছে না কারণ এর সৌখীনত্ব। সৌখীন অভিনয়ে অভিনয়ের মান উঁচু হয় সত্য কিন্তু নাটক প্রতিষ্ঠা পায় না। আর অভিনেতারাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। সে কথা বলাই বাহুল্য। শিল্পকে জীবনে রূপ দিতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। সে সাধানার বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা থাকা একান্তই আবশ্যক। বিশেষ করে স্বাধীন দেশে। দেশ হয়েছে স্বাধীন– আগে যেমন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গবার প্রশ্ন ছিল তখন গড়বার কোন প্রশ্ন জাগেনি– এখন দেশকে আদর্শানুরূপ গড়ে তুলতে হবে সে ক্ষেত্রে

ব্যতিক্রম মনে হতে পারে রবীন্দ্র নাট্য সাধনা। তাঁর নাট্য সাধনার পথ আবার ভিন্ন। সে পথ নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবু এটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি পেশাদার না হলেও তাঁর একটি সম্প্রদায় ছিল এবং তার আচার্য ছিলেন তিনি নিজে।

নাটকের বিশেষ মূল্য আছে তাই প্রয়োজন হয় নাটককে বিকাশ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধার। এই প্রচেষ্টার প্রধান উপকরণ হচ্ছে সাধারণ মঞ্চ।

মফস্বল শহরগুলিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কোন মঞ্চ নেই। এমনকি ঢাকার মত সাংস্কৃতি-সমৃদ্ধ শহরেও উল্লেখযোগ্য কোন মঞ্চ নেই। সাম্প্রতিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট কিছুটা অভাব মেটাচ্ছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় একান্তই নগণ্য। নাটককে যদি জাতীয় শিল্প হিসাবে গ্রহণ করি তবে প্রতিটি মফস্বল শহরে সাধারণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। মঞ্চ নির্মিত হলে নাট্য সম্প্রদায়গুলি ঠিকমত গড়ে উঠবে– নাটকের প্রাণ ফিরে আসবে নাট্যান্দোলন গতি ও পথ পাবে।

সৌখীন নাট্য সমাজ যতদিন তাঁদের নাটুকে নেশাকে পেশায় টেনে নিতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত নাট্য-শিল্পের প্রচার ও উন্নতি হবে না। ভাল নাটকেরও চাহিদা বাড়বেনা। এর জন্য সর্ব প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন।

আপিল

বৃটেনে ভর্তি, ওয়ার্ক পারমিট, ভিজিট ভিসাসহ যে কোন ভিসা রিফিউজ হলে আপিল।

কাজী রকীবুল ইসলাম

বৃটিশ কাউন্সিলের সাবে কর্মকর্তা

ম্যানহাটন টাওয়ার, ৩য় তলা, মালিবাগ মোড়, ঢাকা।

ফোন : ৮৩৫-৮৭১৯, ০১৭৬-৩৭৫৬৬৬, ০১৮৯-২২৫৮৮১